রাক্ষসেরও সম্ভবত এতো ক্ষুধা নেই, যতোটা আছে আমাদের সংসদ সদস্যদের। অবৈধভাবে, ক্ষমতা দেখিয়ে আপাত বৈধতা দিয়ে সুযোগ নেবার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অতুলনীয়। কিন্তু এখানেও তারা থেমে থাকেন না। আইন করে নিজেদের সুযোগ বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে তারা দ্বিধা করেন না একবারও। এবারের বাজেট অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের কিছু সুবিধা বাড়ানোর বিল প্রস্তাবিত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তা পাসও হয়ে যাবে। এই তিনশ' সদস্য কি একবারও ভাবলেন না কোন সময়ে তারা এই কাজটি করলেন। যে বাজেটে জনগণের নিত্যকার প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের দাম বাড়লো কোষাগার বৃদ্ধির জন্য, সেই বাজেট অধিবেশনেই কোষাগার হালকা করে তিনশ' আত্মার তৃপ্তির এ উদ্যোগ কতটা চক্ষু লজ্জার ঊর্ধ্বে... লিখেছেন

গোলাম মোর্তোজা

বাড়ি, গাড়ি, ফোন, বিদেশ ভ্রমণ... সবই চাই

ক্ষুধার্ত সেই তিনশ

বাংলা ভাষার একটি পরিচিত শব্দ 'লজ্জা'। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনেই এই শব্দটির অস্তিত্ব থাকার কথা। কারো কম থাকে কারো বেশি, থাকে সবারই। কিন্তু বাংলাদেশের একটি প্রজাতি আছে যাদের জীবনে এই শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা মুখে বলে গণতন্ত্রের কথা। যদিও তারা সেটা বিশ্বাস করে না। তাদের কাজে কর্মেও তার কোনো প্রকাশ থাকে না। দাবি করে নিজেকে জনগণের সেবক হিসেবে। বাস্তবে জনগণ তাদের দ্বারা সারা জীবন শুধু শোষিতই হয়। নিজেরা ফোন করে, বিল দেয় না। তাদের নামে লাখ লাখ টাকার বিল বাকি থাকে। পত্রিকায় ছাপা হয় সেই সংবাদ। তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। তারা প্রতি বছর নিয়ম করে জনগণের ওপর করের বোঝা চাপায়। যুক্তি থাকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের আয়

বাড়াতে হবে। কমাতে হবে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা। কৃচ্ছ্রতাসাধন করতে হবে জনগণের। যাদের কথা বলছি তাদের নাম রাজনীতিবিদ। তাদের নিয়ে এমন কথা আরো অনেক, অনেক লেখা যায়। তারা যেহেতু 'লজ্জা' নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়, সেহেতু লিখেও কোনো ফল হয় না।

এই রাজনীতিবিদ সম্প্রদায়টি নানাবিধ কর্মকান্ডের কারণে সব সময়ই আলোচনায় থাকে। তারা আলোচনায় থাকতে ভালোবাসে। জনগণের ওপর বাজেট নামক 'দানব' চাপিয়ে দিয়ে তারা এখন আলোচনায়।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সেই বহুল আলোচিত উক্তি, 'দশ জন ফেরেস্তা তিনশ' জন শয়তান নির্বাচিত করবে।' তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন একথা। বলেছিলেন অনেকটা কৌতুক করেই। কিন্তু এই কৌতুকটা যে কত বড় সত্য উচ্চারণ ছিলো, সেটা সম্ভবত সাইফুর রহমান নিজেও বুঝতে পারেননি। তবে জনগণ বুঝতে পেরেছে, পারছে।

হয়েছে ২ কোটি ৩৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। অথচ সরকারি দলেরই রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তিনশ' জনের মধ্যে ষাটজন উপস্থিত থাকলেই যেখানে সংসদ চলতে পারে। সংসদ সদস্যদের থাকার কথা সংসদে। কিন্তু থাকেন না। তাহলে থাকেন কোথায়? যেখানে তাদের স্বার্থ আছে সেখানে। নিজের ব্যবসা বা অন্যের তদবিরের জন্যে তাদের নিয়মিত দেখা যায় সচিবালয়ে। আমলার দপ্তরে ভৃত্যের মতো বসে থাকে জনগণের প্রতিনিধি।

তারা সংসদে আসেন তখন, যখন তাদের নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের প্রসঙ্গ থাকে। শুল্কমুক্ত গাড়ির দাবিতে তারা সংসদে আসেন। উপস্থিত হন নিজেদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির অধিবেশনে। কথায় বলে, নিজের স্বার্থ পাগলেও বোঝে। আর আমাদের সংসদ সদস্যরা বুঝবেন না সেটা তো হতে পারে না।

নিজেদের বেতনভাতাসহ প্রায় সব রকমের সুযোগ সুবিধা আরেকবার বাড়িয়ে নিয়েছেন আমাদের মাননীয়

তিনশ' শয়তানের (সাইফুর রহমানের ভাষায়) ক্ষুধার গ্রাস সমগ্র বাংলাদেশ। এরা যত খায় ততো চায়। এদের ক্ষুধার কোনো ঘাটতি নেই, কমতি নেই। বর্তমান সংসদের সেই তিনশ' জনের ক্ষুধা মেটাতে সমগ্র দেশবাসীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে

এই তিনশ' শয়তানের (সাইফুর রহমানের ভাষায়) ক্ষুধার গ্রাস সমগ্র বাংলাদেশ। এরা যত খায় ততো চায়। এদের ক্ষুধার কোনো ঘাটতি নেই, কমতি নেই। বর্তমান সংসদের সেই তিনশ' জনের ক্ষুধা মেটাতে সমগ্র দেশবাসীকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

ক্ষুধার্ত তিনশ'কে জনগণ ভোট দিয়েছিলো, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে সেই আশায়। তারাও সেরকমই আশ্বাস দিয়ে ভোট নিয়েছিলো। প্রতিটি নির্বাচনেই তারা একাজটি করে। নির্বাচিত হয়ে ভুলে যায় জনগণের কথা। সংসদে এসে নিজেরাই নিজেদের প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে আখের গোছানোর প্রতিযোগিতায়। বিশাল সংসদ ভবন চালু অবস্থায় প্রতি মিনিটে খরচ হয় ১৫ হাজার টাকা। সংসদ চালু থাকে অথচ তারা সংসদে যায় না। কোরাম সংকট এখন সংসদের নিয়মিত বিষয়। বর্তমান সংসদের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধিবেশনে শুধুমাত্র কোরাম সংকটের কারণে অবচয় সংসদ সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর চারটি বিল সম্প্রতি সংসদে তোলা হয়েছে। বাড়ি বাড়া, ঐচ্ছিক তহবিল, আপ্যায়ন ভাতা প্রায় ৪০ শতাংশ, ভ্রমণ কর বাড়ছে। ১ জুলাই থেকে এটা কার্যকর হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বাড়ি ভাড়া বাবদ ৩৫ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। দৈনিক ভাতা ২৫০ টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী। তিনি আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শুধু জিয়ার পরিচয়ে তার মতো একজন গৃহবধূর পক্ষে দুইবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিলো না। এই যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হয়েছে। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তার অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলো সমগ্র বাংলাদেশ। থাকার জন্যে বাড়িসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলো রাষ্ট্র। সেই খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন নিজের জন্যে তার বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কী? তার সন্তানরা এখন বড় হয়েছেন। রাজনীতি করছেন, ব্যবসা করছেন। তার বাড়িভাড়া বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা সম্ভবত নেই। তারপরও তার বাড়ি ভাড়া বাড়ছে, বাড়ছে সুযোগ সুবিধা। আসলে মানুষের চাওয়ার এবং পাওয়ার কোনো শেষ নেই। এটাই সবচেয়ে বড় সত্যি।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বারবার বলতেন, আমার 'চাওয়া-পাওয়ার' কিছু নেই। অথচ রাষ্ট্রীয় গণভবন নিজের নামে করে নিয়েছিলেন তিনি।

স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার (রেমুনারেশন এন্ড প্রিভিলেজ) (সংশোধনী) আইন বিলে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের নিয়ামক ভাতা যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। দু'জনের দৈনিক ভাতা ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ঐচ্ছিক তহবিল ২ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ টাকা করা হয়েছে। মন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়া ১৭ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়া ১৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। মন্ত্রীদের দৈনিক ভাতা ২২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ এবং প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের দৈনিক ভাতা ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মন্ত্রীদের ঐচ্ছিক তহবিলের পরিমাণ ২ লাখ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা, প্রতিমন্ত্রীদের তহবিল ১ লাখ থেকে ২ লাখ এবং উপমন্ত্রীদের তহবিল ১ লাখ থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সাংসদদের ছয় ধরনের আর্থিক সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। ব্যয় নিয়ামক ভাতা ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার, দপ্তর খরচ ১৫০০ থেকে ৬ হাজার এবং নির্বাচনী এলাকা ভাতা ১৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সাংসদদের স্বেচ্ছাধীন তহবিল ৭৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভ্রমণ ভাতা প্রতি মাইল ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রতি কিলোমিটার ৬ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া সাংসদদের টেলিফোন বিল মাসিক ৪ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এই বিলের বিরোধিতা করেছে। '৯১ সালে যখন একবার এমপিদের

সুযোগ-সুবিধা বেড়েছিলো বিরোধিতা তারা তখনও করেছিলো। কিন্তু বৃদ্ধি করা বেতন-ভাতা ঠিকই নিয়েছিলো। এবারও নেবে। আওয়ামী লীগ সংসদ বয়কট করেছে শুরু থেকে। ভাতা কিন্তু বয়কট করেনি। বিএনপি যখন বিরোধীদল তখনও সংসদ বয়কট করতো। তবে ভাতা নিতে ভুলতো না।

এভাবে বারবার নিজেরা নিজেদের সুবিধা বাড়ানোর নজির সম্ভবত পৃথিবীতে বিরল।

সাইফুর রহমান নিজেদের বলেছিলেন শয়তান। অন্যরা একে অপরকে বলেন দুর্নীতিবাজ। আরো পরিষ্কার করে বললে 'চোর'। সংসদে দাঁড়িয়ে বিএনপি সাংসদ এসএ খালেক অভিযোগ করেছেন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন ২৫ লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছেন। এই ঘুষ তিনি খেয়েছেন সন্ত্রাসী গডফাদার ডিপজলের কাছ থেকে। বিনিময়ে তাকে সিএনজি স্টেশনের জমি বরাদ্দ দিয়েছেন। এতদিন অভিযোগ সাধারণত একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে করতো। এখন নিজেরাই নিজেদের সাংসদদের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ করছেন। অথচ একজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ আসার পরও দলের হাইকমান্ড নিশ্চুপ থাকছে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। সেই শ্বেতপত্রে শেখ হাসিনাসহ ১৫জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে আওয়ামী লীগও একটি দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, ছেলে তারেক রহমান, ভাই সাঈদ ইসকান্দারসহ ১০জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

খালেদা জিয়া বলেছেন, শেখ হাসিনা মিগ-২৯ কেনার কমিশন খেয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেছেন খালেদা জিয়া এয়ার বাস কেনার কমিশন খেয়েছেন। এই হলো দেশের প্রধান দুই রাজনীতিবিদের অবস্থা!

জীবনযাত্রার ব্যয় তো শুধু প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের বাড়েনি। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের বেড়েছে। মধ্যবিত্ত হয়ে পড়ছে নিম্নমধ্যবিত্ত। নিম্নমধ্যবিত্তের বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে পড়েছে। নিজেরা নিজেদের সুবিধা বাড়াচ্ছেন, জনগণের কথা ভাববে কে?

প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদরা কত টাকার বেতন পান, কয়টা গাড়ি পান, কতজন পিএস-এপিএস তাদের, তাদের বাগানে কতজন মালি কাজ করে, নিরাপত্তার পেছনে কত ব্যয় ইত্যাদি অনেক বিষয়ের হিসাব জনগণ কখনই জানতে পারে না। যদিও জনগণই এ অর্থের যোগানদার। 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট'-এর নামে এসব তথ্য গোপন রাখা হয়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা এদের পেছনের খরচের নমুনা দেখলে মনে হবে না বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর একটা।

প্রধানমন্ত্রী বেতন, বাড়ি ভাড়া ছাড়াও দেশ-বিদেশে তার সমস্ত সফরের ব্যয়ভার বহন করে সরকার। তার সফরসঙ্গীদের ব্যয়ভারও বহন করে সরকার। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যক্তিগত সচিব, জনসংযোগ কর্মকর্তা, সহকারী ব্যক্তিগত সচিব, দু'জন স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার, ৩ জন ব্যক্তিগত সহযোগী, ব্যক্তিগত চিকিৎসক, হাউজ কিপার, ফটোগ্রাফার, জমাদার, এমএলএসএস, খিদমতগার, কুক, খালাসী, হাউজ ক্লিনার, মালিসহ অন্তত ৫০ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর জন্য কাজ করেন। এছাড়া স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স তো রয়েছেই। এ সবকিছু মিলিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রীর পেছনে পাঁচ বছরে ব্যয় হয় ২০০ কোটি টাকা। সব সময় সব খাতে বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হয় না। বিশেষ করে আপ্যায়নের বিষয়ে আমাদের সরকার প্রধানরা খুব উদার।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অ্যাপায়ন বাবদ প্রতিদিন ব্যয় করেছেন ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রীর জন্য বছরে ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকে। সে হিসাবে বছরে খরচ হওয়ার কথা ৭ কোটি ২০ লাখ টাকা। কিন্তু গত ৮ বছরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আপ্যায়ন খাতে খরচ হয়েছিল ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকারও বেশি অর্থ।

রাষ্ট্রপতির আবাস ও কর্মস্থল বঙ্গভবনের পিয়ন-জমাদার থেকে শুরু করে মিলিটারি অ্যাটাসে পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা ইত্যাদ মিলিয়ে রাষ্ট্রপতির পেছনে ৫ বছরের ব্যয় ১০০ কোটি টাকারও বেশি। অবশ্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রাষ্ট্রপতি হবার আগে বঙ্গভবনে টাকা খরচের কোনো হিসাব ছিল না। সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হবার পর বঙ্গভবনে ঢুকেই চালু করেন বঙ্গভবনে কেন খরচ হলো, কোথায় খরচ হলো, কিভাবে হলো তার উত্তর অনুসন্ধান করা। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের উদ্যোগে করা অডিটে ১৯৯৪-৯৫, '৯৫-৯৬ ও '৯৬-৯৭ অর্থবছরে বঙ্গভবনের হিসাবে বেশ কিছু আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা ধরা পড়ে। দেখা যায় বঙ্গভবনের গোলাপ বাগানে বালু ভরাট, উন্নতমানের গাছ লাগানো কিংবা রাস্তায় বিটুমিন কার্পেটিংয়ের মতো কাজেও আর্থিক দুর্নীতি তো ছিল।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালে। সে সময় আইনটির শিরোনাম দেয়া হয় 'দ্য মিনিস্টারস, মিনিস্টারস অব স্টেট এন্ড ডেপুটি মিনিস্টারস (রেমুনেরেশান এন্ড প্রিভিলেজেস) অ্যাক্ট ১৯৭৩। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার আইন সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়।

এ আইনে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরাসহ তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য কথা হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা বাসাভাড়া, গাড়ি, টেলিফোন, বিদ্যু, গ্যাস যাতায়াত ভাতাসহ নানা সুবিধাদি পাবেন বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবিধ খাতে একজন মন্ত্রী সরকারি গাড়ি পাবেন। গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত, ড্রাইভার, ড্রাইভারের বাসস্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানো হবে সরকারি কোষাগার থেকে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পেছনে সবচাইতে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয় বাসভবনের পেছনে। নীতিমালা অনুযায়ী একজন পূর্ণ মন্ত্রীর বাসভবন সজ্জিতকরণে ১ লাখ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এতে বাসভবনে তিনটি শয়নকক্ষের জন্য খাট, মেট্রেস, তোষক, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, পাটের তৈরি কার্পেট, ড্রয়ারসহ আলমারি, তোয়ালে রাখার র‍্যাকসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, বারান্দা ও রান্নাঘরের আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র তো থাকছেই। বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন বিল মেটানো

হবে সরকারি কোষাগার থেকে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক উল্লেখ নেই। মন্ত্রীদের দপ্তর ও বাসভবনে অতিথিদের যাবতীয় আপ্যায়নের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বহন করবে। বাড়ি ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে তিন মাসের বাড়ি ভাড়ার সমান অর্থ।

ভাড়া করা কিংবা নিজ বাড়িতে মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য বসবাস করলে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সরকারি খরচে নির্মাণ করা যাবে নিরাপত্তা শেড। এ শেড নির্মাণে বরাদ্দ রয়েছে ৪০ হাজার টাকা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরকারি খরচে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ভিআইপি মর্যাদা। ট্রেনে ভ্রমণ করলে দুই কিংবা চার শয্যার এয়ারকন্ডিশন্ড কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ ছাড়াও পাবেন রেল বিভাগের দুইজন বিশেষ সহকারী। লঞ্চে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও পাবেন একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা। জনস্বার্থে বিমানে দেশে-বিদেশে ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করে আইনে বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভার যে কোনো সদস্য প্রয়োজনবোধে এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার রিকুইজিশন করতে পারবেন। তবে আকাশপথে ভ্রমণের পেছনে ইন্স্যুরেন্স সুবিধাসহ ব্যয় করা যাবে বছরে ৫ লাখ টাকা। প্রয়োজনবোধে এর বেশিও ব্যয় করা যাবে কিন্তু তা হবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা লাভের পাশাপাশি একজন মন্ত্রী ব্যয় করতে পারবেন প্রয়োজনীয় অর্থ। প্রচলিত আইনানুযায়ী একজন মন্ত্রী তার কার্যালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারির সমান পদাধিকারের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি, দুইজন ব্যক্তিগত সহকারী, একজন জমাদার ও একজন আর্দালি পাবেন। এছাড়া আরো দুইজন সহকারী পছন্দমতো নিয়োগ দিতে পাবেন একজন মন্ত্রী। এসব ব্যক্তির বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির পেছনে অর্থ ব্যয় করবে সরকার। একজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পেছনে এতো বিপুল আয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা রাখার পাশাপাশি তাদের স্বেচ্ছাধীন অনুদান রাখা হয়েছে ১ থেকে ২ লাখ টাকা।

মন্ত্রীরা আপ্যায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতোই উদার। আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, শাহ এএমএস কিবরিয়া ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ আরো বেশ কয়েকজন একদিনেই আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় করেছেন ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। অথচ নিয়মানুযায়ী একদিনে নয় এক মাসের খরচ হওয়ার কথা এ পরিমাণ অর্থ। বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যরাও একই পথে এগুচ্ছেন। সরকারি টাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের আপ্যায়নের প্রলোভন এড়াতে পারছেন না তারাও।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পেছনে বরাদ্দ ও সম্ভাব্য ব্যয় হিসাব করে দেখা গেছে, বছরে বিশাল মন্ত্রিসভার পেছনে ব্যয় হচ্ছে ৪০০ কোটি টাকার মতো।

দৃশ্যত, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য ও সাংসদদের কাজকর্ম পরিচালনা ও তাদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে সরকারের' ব্যয় হয় ১৫শ' কোটি টাকার মতো।

নতুন করে নিজেদের বেতনভাতা বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। বেড়েছে কাজের পরিধি। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। মন্ত্রী- সাংসদদের কাজের পরিধি বেড়েছে এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। প্রয়োজনের তুলনায় মন্ত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। তাদের অনেকেরই কাজ নেই। আর জীবনযাত্রার ব্যয় তো শুধু প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের বাড়েনি। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের বেড়েছে। মধ্যবিত্ত হয়ে পড়ছে নিম্নমধ্যবিত্ত। নিম্নমধ্যবিত্তের বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে পড়েছে। নিজেরা নিজেদের সুবিধা বাড়াচ্ছেন, জনগণের কথা ভাববে কে? আর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা তারা কোন মুখে বলেন যেখানে বাজেটে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর কর বৃদ্ধি হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তি, 'আমি ভিক্ষা করে যা কিছু আনি, চাটার দল সব চেটে নিয়ে যায়'- আপনারা সুযোগ পেলেই উদ্ধৃতি করেন। কিন্তু সেই অবস্থার কী কোনো পরিবর্তন হয়েছে? এখনও তো আপনারা দরিদ্র জনগণের কথা বলেই ঋণ আনছেন। নিজেদের সুবিধা বাড়ানো ছাড়া কাজটা করছেন কী?

আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ এনে সাইফুর রহমান বলছেন আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে। কম সুদে ঋণ আনতে পেরে তিনি খুশিতে আত্মহারা। কিন্তু সুদের কথা না হয় বাদই দিলাম। মূল টাকাটা তো ফেরত দিতে হবে। ঋণ এনে নিজেদের বেতন বাড়ানোটা অর্থনীতির কোন সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। এই ঋণ কী শুধু আপনাদের ক্ষুধার্ত তিনশ'জনকে দিয়েছে, না দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষকে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তি, 'আমি ভিক্ষা করে যা কিছু আনি, চাটার দল সব চেটে নিয়ে যায়'- আপনারা সুযোগ পেলেই উদ্ধৃতি করেন। কিন্তু সেই অবস্থার কী কোনো পরিবর্তন হয়েছে? এখনও তো আপনারা দরিদ্র জনগণের কথা বলেই ঋণ আনছেন। নিজেদের সুবিধা বাড়ানো ছাড়া কাজটা করছেন কী?

বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হচ্ছে। রাজনীতিবিদদের ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। আমলাদের ক্ষুধা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের চেয়েও বেশি। নিজেদের ধুরন্ধর বুদ্ধি দিয়ে তারা সেই ক্ষুধা আড়াল করে রাখতে পারে, জনগণ থেকে। রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি এবং অযোগ্যতা আমলাদের সকল ক্ষমতার উৎস। তিনশ' ক্ষুধার্ত রাজনীতিবিদ আর কয়েক হাজার আমলা মিলে গিলে খাচ্ছে বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের জনগণকে। জনগণ যে এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে কবে মুক্তি পাবে কেউ তা জানে না। আদৌ কী কোনো দিন মুক্তি পাবে? রাজনীতিবিদরা ঋণ করে ঘি খাবে— আর জনগণ শুধু তাকিয়ে দেখবে? ঋণ করে যারা ঘি খাচ্ছে তাদের আসলে কিন্তু এর প্রয়োজন নেই। বৈধ-অবৈধ ব্যবসা করে তাদের প্রায় সবাই এখন কোটিপতি। বিশেষ করে নির্বাচিত তিনশ' নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের প্রায় সবারই ঢাকায় গাড়ি, বাড়ি... আছে। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় বেতন, বাড়ি ভাড়া বা ভাতার কোনো প্রয়োজনই হয় না।

জনগণ এদেরকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। সম্ভবত এই আশায় যে, একদিন তাদের ক্ষুধা মিটবে। তারপর এরা জনগণের ক্ষুধার কথা ভাববে। কিন্তু তাদের ক্ষুধার যে কোনো শেষ নেই বোকা জনগণ কখনো বোঝে না। স্বৈরাচার সামরিক শাসক তাদের শোষণ করে। তাদের শোষণ করে গণতন্ত্রের 'আপোসহীন' এবং 'দেশরত্ন' নেত্রীরাও।

জনগণও এটাকে মেনে নিয়েছে, সম্ভবত তাদের নিয়তিই তাই।

কার্টুন : **মশিউর রহমান রানা**